প্রথম সংস্করণ শ্রাবণ ১৩৬৭

মুদ্রক
শ্রীশিশিরকুমার সরকার
শ্যামা প্রেস
২০বি, ভুবন সরকার লেন
কলিকাতা-৭

প্রকাশক
মিহির ভট্টাচার্য
১০ রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট
কলিকাতা-৬

কবি অমিয় চক্রবর্তী
করকমলেষু

সূচীপত্র

কা লে র রা খা ল

এ ক টি আ লো র পা খি

কালের রাখাল

জীর্ণবস্ত্র রঙিন সুতোয় রিপু ক'রে
শিশির-গেরুয়া-পরা
ভোরের বাউল।

একতারা হাতে নিয়ে
ঘুঙুরের বোল তুলে পথের মাটিতে
বিস্ময়ে অবাক্।

নিশান্তের নির্জন প্রান্তর
শিশিরে কোমল হয়ে আছে।

সংহার-ত্রিশূলে মাথা রেখে
মহাকাল
একফালি চাঁদের দর্পণে
অর্ধনারীশ্বর।

স্বপ্ন

দু'পাশে সোনালি শস্য—আদিগন্ত থৈ থৈ মাঠ,
শস্পশ্যাম গোচারণে পরিতৃপ্ত শ্যামলী ধবলী,
বটের পাতারা নাচে রাখালের মুরলীর সুরে।

মধ্যভাগে রাজপথ টকটকে লালস্বপ্নে মোড়া,
আশ্‌মানি আকাশপটে ছবি-আঁকা চিম্‌নির পেন্সিলে,
দানবের যন্ত্রপুরী মানবের সেবায় দীক্ষিত।

অক্লান্ত বলিষ্ঠ যুবা দৃপ্তপদে চলে রাজপথে,
অফুরন্ত শ্রমশক্তি উচ্ছ্বসিত ইস্পাত-পেশীতে,
নয়নে নক্ষত্ররশ্মি, ওষ্ঠাধরে অপ্রমত্ত প্রেম।

কদম্ কদম্ চলে পাশে পাশে সঙ্গিনী যুবতী,
স্বাস্থ্যের অজস্রদানে বেপরোয়া যৌবন-হিল্লোল,
বুকের যুগলভাণ্ডে অনিঃশেষ সুরভির সুধা,
নিটোল বাহুতে বাঁধা কোলজোড়া শিশুর উল্লাস।

তোমাকে প্রণাম করি, জন্মভূমি আমার জননী।

পনেরো আগস্ট
১৯৪৭

সুন্দরবনের ডাকে

কাজলা দিঘির জলে নয়,
সমুদ্রের সমারোহে
লক্ষ লক্ষ শ্বেতপদ্ম ফোটে।

আদিম অরণ্যতলে
ওৎ পেতে বসে থাকে
ডোরাকাটা মরণের দূত।

বনবিবি ক্ষিপ্ত হলে ডেকে আনে সমুদ্রের ঝড়,—
গাছে গাছে আকাশের ওঠে হাহাকার ;
কম্পিত কুলায় থেকে
অসহায় শিশুগুলি
ফলের মতন ঝরে টুপ টুপ টুপ।

কচি মাংসে উষ্ণ রক্তে কী স্বাদু পশুর প্রাতরাশ

তবু ওই যাযাবর প্রবাসী পাখিরা
সুন্দরবনের ডাকে উড়ে আসে মৌসুমি হাওয়ায়।
বাসা বাঁধে
ডিম পাড়ে
শ্বেতপদ্ম ফোটায় আকাশে।

নবজাতক

কড়া খাড়া রোদ মাঠে,
মেটে শাদা শুয়োরের দল
ঘুরে ফেরে বেওয়ারিশ মাঠে।
কুশ্রী জীব, কদর্য গড়ন ;
কাদা ঘাঁটে, নোংরা খায়,
জুগুপ্সা জাগায়।
ওরি মাঝে
দেখো দেখো, কী আশ্চর্য দুটি ছোট ছানা।—
গোলাপী ফুলের রং তুলতুলে তুলো দিয়ে ঢাকা।
তুরতুরে চার পায়ে নেচে নেচে চলে।
পায়ের পাখায় যেন মাটির আকাশে উড়ে যায়।
উড়ে যায় গান হয়ে,—শব্দহীন জীবনের গান।

ওরা আগন্তুক,
মর্তের মাটির বুকে প্রাণের আনন্দ ওরা,
নাচের পুতুল।
দেখো দেখো
কী সুন্দর,
খোলা মাঠে খেলা করে নবজাত শুয়োরের ছানা।

আকাশপথে কলকাতা থেকে গৌহাটি

আকাশ-শিল্পীর আঁকা
অপূর্ব-সুন্দর চিত্রশালা
এই বসুন্ধরা,—
শিশু-বিধাতার খেলাঘর।

বহু নিয়ে ভেসে আছে
সাদা সাদা মেঘের পাহাড়।
মনে হয় রাশিরাশি
পেঁজা তুলো শূন্যে উড়ে যায়।
তারি ফাঁকে চোখে পড়ে
তন্বী-শ্যামা আমার পৃথিবী
শাশ্বতযৌবনা।

কোথাও বা শহরের রয়েছে মডেল।
কোথাও মাঠের বুকে সবুজ গাঁয়ের ছবি আঁকা।
কালো কালো বিন্দুগুলি মানুষের সত্তার সংকেত।

কোথাও বা মামণির চুলের নীলচে ফিতে—
আঁকাবাঁকা নদী।
কুটিল পদ্মার বুকে পিঙ্গল বালুর চর
নকশা কাটা-কাটা।
যেন বা উপুড়-করা সমুদ্রের বিশাল ঝিনুক,
অথবা বিরাট তিমি বালুজলে ল্যাজ উঁচু-করা।

হঠাৎ তাকিয়ে দেখ
ফসল-মাঠের জমি
মোজেইক-করা যেন সাজানো পাথর।
সবুজে হরিতে মিলে কী বিচিত্র রঙের বাহার।
ফ্রেমে-বাঁধা ল্যাণ্ডস্কেপ অবনীন্দ্র ঠাকুরের আঁকা।

সমতল মাঠগুলি নিমেষে হারিয়ে যায়
ঘননীল অরণ্যের বুকে।
শুরু হয় সাস্থমান পর্বতের চড়াই উৎরাই।
গারো-পাহাড়ের মাথা
কাফ্রীর চুলের মত
কুঞ্চিত মসৃণ।
যেন বা অগুনতি হাতী দল বেঁধে চলেছে কোথায়—
তাদের পিঠের মতো
ধূম্রবর্ণ আসামের অসংখ্য পাহাড়।
চলায় পথের দড়ি আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধেছে তাদের;
কোথাও শিখরে চ'ড়ে
দেখেছে নগাধিরাজ দেবতাত্মা নয়,
গিরিশৃঙ্গ মানুষেরি নির্ভীক নিবাস।

তারো ঊর্ধ্বে
পনের হাজার ফুট শূন্যপথ পরিক্রমা করে
মধ্যবিংশ শতাব্দীর নবমেঘদূত।

আকাশের চিঠি : নীলাকে

বৈশাখী আকাশ আজ
মেঘে ঢাকা।
মোহনবাড়ির ঘাঁটি ছেড়ে এসে
গৌহাটির পথে
আমাদের 'ক্রেওশিপ' ওড়ে।

শত শত তীর-বেঁধা
সবুজ গালিচা-পাতা চা-বাগান
পেরিয়ে এলাম।

হঠাৎ অপূর্ব দৃশ্য
চোখে পড়ে :
আদিগন্ত প্রসারিত দুধ-সাদা মেঘের সাগর
আনন্দে উদ্বেল।
ফেনশীর্ষ তরঙ্গেরা
দিগন্তে সূর্যাস্ত দেখে যেন বা অবাক্!

মেঘের সাগর কোথা!—
পৃথিবীর কী বিচিত্র শ্যাম শোভা
হরিতে শ্যামলে!
অরণ্যের ওড়নায় নানা বর্ণ নয়নলোভন।

ব্রহ্মপুত্র বুড়ো হয়ে গেছে।
বুকে তার বড়ো বড়ো চড়া।
দেখে মনে হয় যেন লক্ষ্যহারা অষ্টাবক্র মুনি।

গোধূলি-আলোয়
একটি শহর দেখা যায়।—
পসরায় খেলনা যেন ইতস্তত রয়েছে ছড়ানো।

সন্ধ্যার আঁধারে
অসংখ্য বিদ্যুৎ-বাতি খদ্যোতের মতো জ্বলে নেভে।
মনে হয়
মাটিতে এসেছে নেমে অনুতপ্ত সহস্রলোচন।
অভিশপ্তা অহল্যাকে অন্ধকারে খুঁজে ফেরে বুঝি!
সহস্রলোচন কোথা!—
রাশি রাশি মুক্তো আর হীরকের হার,
—রজনীর রম্য প্রসাধন—
পরেছে গৌরব-ভরে গৌহাটি শহর।

তোমাদের শান্তিনিকেতনে
খুব ঝড় হলো বুঝি
পয়লা বোশেখে
কল্‌কাতা কেমন আছে
কিছুই জানি না।
দমদমে ঝড় হবে?
হতে পারে।—
পৌঁছব নটায়।

আকাশের আয়নায়

আকাশের আয়নায় ঢেউ উঠে
ঢেউ ভেঙে যায়।

সূর্য শত খণ্ড হয়ে
জলেতে আগুন হয়ে জলে।
চাঁদের কলস থেকে
সুধার কণিকাগুলি যায় ভেসে ভেসে।

কেবল গভীর রাতে
দুরন্ত বাতাস থেমে গেলে
চাঁদের কপালে চাঁদ টিপ দিয়ে যায়।
তারাগুলি ইশারায় চুপিচুপি কানাকানি করে।

তখন সূর্যের কথা একবার মনেও পড়ে না।

দুঃস্বপ্ন

রুদ্ধশ্বাস অন্ধকারে
বিশ-শতকের মাঝরাতে
একটি মর্ত্যের শিশু দুঃস্বপ্নের বিভীষিকা দেখে :
আঁস্তাকুড়ে
মরা বেড়ালের পাশে
মরে পড়ে আছে
জরাজীর্ণ বুড়ো ভগবান।
নাড়ি-ভুঁড়ি বের করে করে
শকুনিরা ছিঁড়ে ছিঁড়ে খায়।

নারকীয় প্রেতাতঙ্কে ভয়ে ভয়ে রাত শেষ হয়।
পূবের জানালা দিয়ে ভোরের প্রথম আলো আসে
পাশে শুয়ে মাতা।
একটি স্বর্গের শিশু জন্ম নেবে জননী-জঠরে।
জন্ম নেবে শিশু-ভগবান।
জরায়ুতে তারি সম্ভাবনা
প্রাণের প্রথম নৃত্যে পুলকিত রোমাঞ্চ জাগায়।
স্বপ্ননিদ্র নিশান্তের মায়াবী আলোয়
জননীর স্মিতমুখে ফুটে ওঠে স্বপ্নরেখা হাসি।

কে কাকে মেরেছে ভাই

কে কা'কে মেরেছে ভাই, ভুলে যাও হিন্দু না মুসলিম,
মানুষের পশুহাতে অসহায় মরেছে মানুষ,
নরঘাতী নিষ্ঠুরতা অন্তরকে জেগেছে আদিম—
নিঃসঙ্গ শিকার ধ'রে হিংস্রোল্লাসে মত্ত কাপুরুষ।
কোথায় চলেছ ভাই, বলে যাও হিন্দু বা মুসলিম,
আমাদের রক্ত দিয়ে কে রাঙালো মিথ্যার ফানুস?
মানুষের এ কলঙ্ক মহাকাশ ছুঁয়েছে অসীম,
শয়তানের জাহান্নমে মাতমন্ত্রে আমরা বেহুঁশ।

আসমুদ্র হিমাচলে একসূত্রে গাঁথা ছিল প্রাণ,
মন্দিরের পাশে পাশে মসজিদের উঠেছে মিনার,
বেদমন্ত্রে মিলে গেছে আজানের উদাত্ত আহ্বান —
সে ধ্বনিতে ঐক্যবদ্ধ সাতলক্ষ পল্লীর কিনার।
কোথায় চলেছ ভাই, হাতে হাত আবার মিলাও,
মানুষের নাম ক'রে ভারতের প্রাণ ফিরে দাও।

ভগ্নপক্ষ

আমি নই রাজহংস—শুভ্রপক্ষ মেলে নভোনীলে
বলাকার মালা হয়ে দুলে যাব ধরণী-সীমানা,
অলকাবিলাসী নই—মানসের স্ফটিক-সলিলে
স্বপ্নিল কমল-বনে চঞ্চুকেলি নেই মোর জানা।
ঝড়ে-পড়া পাখি এক, কাদামাখা, ভাঙা দুই ডানা,
প্রলয়ের সন্ধিলগ্নে হারায়েছি আশ্রয়-শাখাটি,
আমার আকাশ নেই, আছে শুধু পৃথিবীর মাটি
আর আছে ভীরু বক্ষে সবগ্রাসী মৃত্যুর ঠিকানা।

তবু জানি এই মৃত্যু পার হতে হবে একদিন—
তাই তো অমৃত-মন্ত্র জপ করি ধূলির আসনে,
জানি চক্ষে আলো নেই, তবু আশা আছে মনে মনে—
জড়ময়ী এ পৃথিবী শোধ ক'রে দেবে সব ঋণ,
এ প্রলয়-রাত্রিশেষে দেখা দেবে প্রত্যুষ নবীন,
অভিশপ্ত মৃত্যুপুরী ভেসে যাবে প্রাণের প্লাবনে।

খ্রীস্ট-জন্মদিনে

খুলে দাও রুদ্ধ দ্বার
বাতায়ন মুক্ত করে দাও।
কেটেছে শীতের রাত
শেষ হয়ে এসেছে আঁধার।
আলোর মহল খুলে
হাসিমুখে এসেছে অতিথি।

বৈতালিক

ভোরের আকাশখানি বজ্রনীল শাণিত ইস্পাত।
আকাশশিল্পীর হাতে স্বর্গের সংগীত
এখনো হয়নি শুরু সপ্ততন্ত্রী আলোর বীণায়।
শুধু তার সুরবাঁধা-কাজে
টুংটাং উঠেছে ঝংকার।
তারি সাথে গলা সাধে প্রভাতের বৈতালিক দল।

কোকিল-কাকলি নয়,
নয় শ্যামা-দোয়েলের মধুর মুরলী।
নিশান্তের অন্ত্যজ কূজন,—
কাকের কর্কশ কণ্ঠে ঘুম-ভাঙানিয়া গান শুনি।

সে গান মাটির থেকে আকাশের সীমা ছোঁয়-ছোঁয়।
সে গান তমিস্রা থেকে চেতনাকে করে আহরণ।
সে গান উদয়াচলে উদেতব্য দেবতার স্তব।

বহ্নিস্তোত্র

হে বহ্নি, আমায় তুমি স্পর্শ কর এই সুপ্রভাতে,
সর্বমোহমুক্ত ক'রে সর্বশুচি কর এ জীবন,
অনির্বাণ দীপ্তি দাও ক্ষীণপ্রভ প্রাণের শিখাতে,
উঠুক প্রোজ্জ্বল হয়ে মৃত্যুত্তীর্ণ নবজাগরণ।
আরণ্যক ভারতের অগ্নিহোত্রী আর্য-সাধনাতে
সবিতৃ-বরণ্যে তুমি মানুষেরে করেছ বরণ,
তারপর যুগে যুগে দীপ্ত হয়ে সাগ্নিকের হাতে
বারবার পৃথিবীর তমোভার করেছ হরণ।

দেখেছি নয়ন ভরে ব্রাহ্মণের ভাস্বর মহিমা,
দেখেছি ক্ষত্রিয়বীর্য ভারতের রাজছত্রতলে,
বৈশ্যেরো দেখেছি স্পর্ধা লঙ্ঘি' গেল স্বীয় মর্ত্যসীমা,
ভূমিগর্ভ হ'তে আজ শূদ্রশক্তি এলো দলে দলে।
জাগে নব-মানবতা, দিকে দিকে তারি জয়গান,—
হে বহ্নি, আমায় তুমি এ প্রভাতে কর জ্যোতিষ্মান।

আমরা বামন

আমরা বামন
তোমাদের কাঁধে চ'ড়ে মহাকাশ দেখি।

অনাদি রহস্যে ঢাকা
পৃথিবী বিশাল ছিল তোমাদের,
চিরন্তন বিস্ময়ের আকর আকাশ।

তোমাদের পৃথিবীতে
ব্যূঢ়োরস্ক পুরুষেরা ছিল,
অনাঘ্রাতা পুষ্পিতা রমণী।

তমসার পরপারে
জ্যোতির্ময় জীবনকে তোমরা দেখেছ।

আমরা বামন
আমাদের চারপাশে চেনা-জানা বস্তুসমারোহ।
দু'হাত-ফেরতা মালে
জীবনের বিপণি বোঝাই।

ওরি মাঝে কোনো কোনো দিন
হরপ্পা-মহেঞ্জোদড়ো থেকে
মানবমহিমা নামে
প্রাক্‌পুরাণিক।

তোমাদের মহাকাব্য থেকে
নেমে আসে
শালপ্রাংশু মহাভুজ পুরুষের দল,
নেমে আসে
সঞ্চারিণী পল্লবিনী নারী।

এক পেয়ালা চা

চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে
বিস্বাদ লেগেছিল প্রথমে।
একটু বেশি গরমও ছিল,
জিব পুড়ে যাবার জোগাড়!

কিন্তু শীতের দিনে
তৃষিত মানুষের কাছে
এক পেয়ালা গরম চা
মর্ত্যের অমৃত।

হয়তো একটু কড়া,
একটু তেতো,
দুধের ছোঁওয়া লেগেছে কি লাগেনি।
তবু অমন তৃপ্তি আর কিসে পাবে বল?

জীবনের পেয়ালায় আমি যতই চুমুক দিই
ততই মিষ্টি লাগে।
চিনি পড়ে আছে তলায়।

শুভ্রবৈদ্য

রাত চারটে।
সূর্যের ঘুম ভাঙে নি,
ওদের ভেঙেছে।
শেষরাতের নিস্তব্ধ অন্ধকারে
ভেসে আসছে ওদের জীবনসংগীত।

ভোরের সূর্য যখন ওদের মুখে
আলোর আদর পাঠাবে
তখন ফুটবে ওদের রূপ—
ঝিলের ধারে
আধ-হাঁটু জলে দাঁড়িয়ে
নম্র পিঠকে ধনুক ক'রে
কাঠের পাটার বুকে ওরা জীবনের গান বাজায়।
বসন-পরিশোধনের গান।

সভ্য মানুষের সনাতন শিল্পী ওরা—
মালিন্যকে অমলিন করার বৈদ্য।

শেষরাত থেকে ভোর,
ভোর থেকে সকাল,
সকাল থেকে দুপুর যায় গড়িয়ে—
তবু ওদের কাজের বিরাম হয় না।
দুটি পেশল বাহুর মায়াস্পর্শে
শূন্যে পূর্ণ একটি বৃত্ত রচনা ক'রে
কাপড়ের মালা আছড়ে পড়ে কঠিন পাটার বুকে।

ধীরে ধীরে তার রঙ বদলায়,
বার বার জলে পা ধুয়ে
দেহে লাগে সিক্ত রোদের শুভ্রতা।
পৃথিবীর মাটি হয় আকাশের আলো।

বেলা পড়ে এলে
বিকেলের প্রসন্ন আলোয়
একবার ওদের দিকে তাকাও।—
ধরজির যুগল-লতায় অসংখ্য ফুল ফুটেছে,
হাওয়ায়-দোল-খাওয়া দুধসাদা একরাশ ফুল।
ওই ফুল গায়ে জড়িয়ে বাবুরা ফুলবাবু হয়।

জাল

পালাবার পথ নেই,
ওৎ পেতে বসে আছে অব্যর্থ শিকারী।

হরিণচরণে ছুটে যাবে?
উড়ে যাবে ঈগল-পাখায়?

তার জালে ছিদ্র নেই,
সারাটা গগনবেড় জাল।

কাশী মিত্তির ঘাটে

বিকেলের আকাশে মেঘের চিতায় সূর্য পুড়ছিল।
গঙ্গায় কাশী মিত্তির ঘাটে তার প্রতিবিম্ব দেখলাম।

কত বিদগধ জন   রসে অনুমগন
অনুভব কাহু না পেখ।
কহ কবিবল্লভ   প্রাণ জুড়াইতে
লাখে না মিলল এক॥

তুমি ছিলে সেই একলাখের একজন।
পরিশীলিত পাণ্ডিত্যের পরিচ্ছন্ন পোশাকে
রসের সাগরে ডুব দিয়েছিলে।
তুমি প্রেমিক। তুমি রসিক। তুমি কবি।

নিঃসঙ্গ শ্মশানশয্যার পাশে ব'সে ভাবছি
তোমার যৌবনের লীলাসঙ্গীরা আজ কোথায়?
প্রৌঢ়প্রজ্ঞার প্রিয়শিষ্যরা?

হায় রে হৃদয়
তোমার সঞ্চয়
দিনান্তে নিশান্তে শুধু পথপ্রান্তে ফেলে যেতে হয়।

মাঘের গোধূলি ঘনিয়ে আসছে।
কালের হাওয়া লেগেছে ভাগীরথীর হিমেল প্রবাহে।
এই হাড়-কাঁপানো শীতে প্রাণের উষ্ণস্পর্শ পাচ্ছি
তোমার মর্ত্যলীলার শেষরশ্মিতে।

অগ্নিজিহ্বায় দেহরস পান ক'রে
শ্মশানমালকে ফুটে উঠছে অসংখ্য স্বর্ণচাপা।

আকাশে তাকিয়ে দেখি
মেঘাবরণমুক্ত সূর্য অস্তদিগন্তে চিরজ্যোতির্ময়।

১৬ মাঘ
১৩৭৪

স্বর্ণবিন্দুশীর্ষ কাশফুল

বন্যায় ডুবেছে দেশ
তবু তো শরৎ এলো বিষণ্ণ আকাশে।

মৃত্যুর দুঃস্বপ্ন-ঘেরা ভয়ংকর রাত ছিল কাল,
হঠাৎ নিশুতি ঘুমে আর্তস্বরে ডেকে উঠলো কাক

কালিন্দীর দুই তীরে,
পঞ্চগ্রামে,
ভুবনপুরের হাটে,
অন্ধকার
শুধু অন্ধকার।

বিলাসের রঙ্গশালা থেকে
একটি একটি ক'রে
জলসাঘরের আলো
নিভে যায়।
জীবনমশায়
অধ্রুব আরোগ্যনিকেতনে
বৃথা খোঁজে জরা-ব্যাধি-মৃত্যুর নিদান।

ওদিকে দিগন্তজোড়া মাঠে
অরণ্যপ্রান্তর থেকে ভেসে আসে
সবুজে-হলুদে মিলে-করা
হাঁসুলীবাঁকের উপকথা।
নাগিনীকন্যার কাহিনীতে
উলঙ্গ প্রাণের নৃত্য দেবতার নিষিদ্ধ দেউলে।

কালের পুতুল ওরা
মৃত্যুর মাধনে ডুবুডুবু।

তবু রাত ভোর হয়।
পূবের আকাশে ভাসে বৃন্তহীন সোনার কমল।
তারি আলো চোখে নিয়ে,
মৃত্যু নয়,
জীবনের জয়ধ্বনি করে
স্বর্ণবিন্দুশীর্ষ কাশফুল।

২৮ ভাদ্র
১৩৭৮

চতুষ্ক

পৃথিবী-তমসাতীরে কোকমিথুনের নিধুবনে
মহাকাল-নিষাদের নিত্য ছোটে মৃত্যুর শায়ক ;
আমার বুকের নীড়ে ভীরু পাখি কাঁপে প্রতিক্ষণে,
আমি মহাকবি নই, আমি এক ট্র্যাজেডি-নায়ক ।

সেই মৃত্যুতমসায়

'অভিশপ্ত,
নিয়তি চিহ্নিত', ব'লে
অলৌকিক আলোগুলি কেবলি আলেয়া হয়ে যায়।

নিষ্প্রদীপ অন্ধকারে
ঈগল-পাখায়
মৃত্যু আসে।

সেই মৃত্যু-তমসায়
ফাল্গুনী পূর্ণিমা এলো
ভুজঙ্গে অমৃত আশ্লেষ।

বিষামৃত

কারো বা আকাশে গ্রীষ্ম, স্মরভস্ম হর-কোপানলে—
সূর্য যেন শংকরের ক্রোধোদ্দীপ্ত তৃতীয় নয়ন ;
কারো বা বিরহ নামে আষাঢ়ের দুরন্ত বাদলে—
শূন্য মন্দিরের বুকে নিদ্রাহারা কণ্টক-শয়ন।
কারো ভাগ্যে বর্ষারাতে প্রেয়সীর অভিসার চলে,
রতিবন্ধু প্রজাপতি র'চে দেয় বাসর-মিলন ;
আষাঢ়ের বিভাবরী ঘন হয় বরমাল্য গলে,—
পুষ্প আর পুষ্পতনু,—স্পর্শরসে একই আস্বাদন।

সমুদ্র মন্থন ক'রে উঠেছিল কমলা-বসুধা,
মৃন্ময় রসের ভাণ্ডে জমা তার অমিয়-গরল ;
সম্ভোগের শেষ নেই, যত তৃপ্তি তত বাড়ে ক্ষুধা,
বিরহ-মিলন-চক্রে মত্যলীলা চলে অবিরল।
কারো বা কপাল-গুণে কণ্ঠ জুড়ে শুধু হলাহল,
কেহ বা জীবনভরে অবহেলে পান করে সুধা।

আলোর মরাল

দুর্যোগের মেঘে-ঢাকা কৃষ্ণপক্ষ রাত ছিল কাল।
কালবোশেখির ক্রোধ ক্ষিপ্ত ছিল পল্লীনিকেতনে,
শেষ-বসন্তের কান্না ঝরেছিল নারিকেল-বনে,
অশুভ কী আশংকায় বিশ্ব ছিল বীভৎস ভয়াল।
প্রসন্ন আকাশে আজ আনন্দিত এসেছে সকাল—
সে যেন স্বর্গের শিশু, দুধে-দাঁতে হাসে ক্ষণে ক্ষণে,
মর্ত্যবালিকার খুশি দোল খায় পুবালি পবনে ;—
দূর-শূন্যে উড়ে যায় শ্বেতশুভ্র আলোর মরাল।

‘তুমি দূরে চলে গেলে জীবন আঁধার হয়ে আসে’,—
বলেছিলে কাল রাতে যন্ত্রণায় বিষণ্ণ ভাষায়,
কপোলে মুক্তোর মালা ঝরেছিল বুকের আঁচলে।
আজ ভোরে ঘুম ভেঙে কণ্ঠ জাগে ললিতে-বিভাসে,
অধর তৃষিত হয় কী নব জীবন-পিপাসায় ,—
প্রিয় দূরে চলে যায়, প্রেম তবু হাসে পূর্বাচলে।

আমার নায়ক

সেও তো মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ে বাঁচতে চেয়েছে।
রুদ্ধশ্বাস দ্বৈরথ-সমরে
যৌবন সহায় ছিল তার।
প্রেম এসে বলেছিল
তোমার পিপাসাপাত্র সুধা দিয়ে ভ'রে দেব আমি।

বক্রহাসি হেসেছিল মহাকাল—মৃত্যুর সারথি।

দুর্নিবার সময়ের চক্রতলে বিদলিত হয়ে
যৌবন বিদায় নিয়ে গেল।
প্রেমের পানীয় হল বিষ।

জীবনের রঙ্গমঞ্চে যবনিকা ওঠে আর নামে।
শেষদৃশ্যে দেখা গেল
পথের ধুলোয়
মুখ থুবড়ে পড়ে আছে আমার নায়ক,
পরাজিত,
তবু জানি পলাতক নয়।

আমিও

আমিও মৃত্যুর সাথে
পাশাখেলা
অনেক খেলেছি,
এবং প্রেমের সাথে।

কখনো সর্বস্ব ছিল পণ,
কখনো জীবন।

যখন ভেবেছি মনে
জয় হলো
তখনই চরম পরাজয়

শিবিরে শিবিরে

রাতের শিবির থেকে
　　　　দিনের শিবিরে—
সংগ্রামের হাতিয়ার
　　　　দুই হাতে নিয়ে
সাজবদলের পালা
　　　　ঘড়িতে ঘড়িতে।

পয়োমুখ পড়োশির নিপুণ মুখোশে
বহুশীর্ষ সমাজের উচ্চাবচ সোপানে সোপানে
স্বর্গাদপি স্বদেশের এপারে ওপারে
অগণন
অশ্ব গজ রথী পদাতিক।

দিনের শিবির থেকে
　　　　রাতের শিবিরে—
অন্ধকার ঘন হয়ে এলে
প্রতিপক্ষ আসে আরো কাছে।
অস্তিত্বের আলো-আঁধারিতে
আমাকে দু'ভাগ ক'রে শুরু হয় সম্মুখ-সমর।

নিষ্ক্রমণ

মুক্তির পথ তো খোলাই ছিল,—
মহাকালই খুলে রেখেছেন।
তবে কেন অমন ক'রে চলে গেলে ?

বেদনায় কাঁদলে না,
কাঁদালেও না।

রঙ্গমঞ্চে আবার যবনিকা পড়ল।
প্রেক্ষাগৃহ ভেসে গেল প্রহসনের অট্টহাসিতে।

যুগ্মক

আমারি প্রাক্তন স্বপ্ন, পথে দেখা, এলো কাছাকাছি—
শুধালো, 'আছেন ভালো?'—ম্লানমুখে কহিলাম, 'আছি।'

জীবনের জনারণ্যে

জীবনের জনারণ্যে কত শব্দ, কত কোলাহল !
সংসার-সৈকতে ব'সে পরচর্চা রসনারোচন—
কার চিত্ত কোথা বাঁধা, কার হল বন্ধন-মোচন,
কার ওষ্ঠে সুধা ওঠে, কার কণ্ঠে কেবলি গরল।
কত ধানে কত চাল, তারি ভাষ্য চলে অবিরল !
রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি, কত তথ্য-তত্ত্ব-আলোচন,
রাজা-ও-উজির-মারা কি বিক্ষোভ, কি অনুশোচন !
বাগ্‌যুদ্ধে দিগ্‌বিজয় সংগ্রামের শেষের সম্বল।

তুমি শুধু একা ব'সে চুপ ক'রে চোখ তুলে চাও,
সে চাওয়ায় জীবনের সব-কথা সুধা হয়ে ঝরে,
তৃষাতপ্ত এ ধরায় সে-সুধার ধারা তুমি ঢালো।
গোধূলি-আকাশে তাই ভেসে আসে কনে-দেখা আলো,
দিগ্‌বধূর আঁখিদীপে সন্ধ্যাতারা প্রেমারতি করে,—
হঠাৎ তোমার চোখে তারাভরা আকাশ উধাও।

স্বর্ণকমল

একদিন কাঞ্চনজঙ্ঘার চূড়া দেখেছিলাম—
প্রভাত-সূর্যের আলোয় স্বর্ণকমলের মত বিকশিত।

তারপর নেমে এসেছি
সমতল মাটির শ্যামল শুশ্রূষায়।
নদীর কলধ্বনি আর প্রান্তরের পদাবলী
আমার মন ভুলিয়েছে।

ঘর বেঁধেছি শহরের অনভিজাত পাড়ায়,
সিমেন্ট-কংক্রিটের স্তূপে আকাশ পড়েছে ঢাকা।
পিচ-ঢালা রাজপথে-পথে
নাগর-বিহঙ্গের অভিশপ্ত ক্রেংকার
আমার রক্তে জাগিয়েছে মৃত্যুর যন্ত্রণা।

সংসারচক্রে বদ্ধ-জীব আমি।
কলুর চোখঢাকা বলদের মত
কাঁধে ব'য়ে চলেছি বাসনার পাহাড়।
জীবনের অন্ধগলিতে সূর্যের মুখ দেখা যায় না।

তবু কোনো-কোনো দিন
বিনিদ্র রাতের তন্দ্রাচ্ছন্ন চেতনায়
ভেসে ওঠে কাঞ্চনজঙ্ঘার চূড়া :
প্রভাত-সূর্যের আলোয় স্বর্ণকমলের মত বিকশিত।

মেঘৈর্মেদুরমম্বরং

রুদ্রের তৃতীয় নয়নের বহ্নিতে
মদনভস্ম দেখলাম
প্রৌঢ়-বৈশাখের মহানগরীতে

ভোরের আকাশবাণী খবর দিয়েছিল—
আজ আকাশে জমবে মেঘ,
নামবে বৃষ্টি,
বাইশে বৈশাখ হবে আষাঢ়ের প্রথম দিবস।

দিঙ্‌মণ্ডলের ভাগ্য-গণনা আজ সার্থক হল।
আকাশ হল মেঘমেদুর।
শ্যামরূপের মায়ায় রুদ্রের তৃতীয় নেত্র হল
জয়দেবের কোমলকান্ত পদাবলী।

এমন দিনে মনে পড়ল
—ময়নাপাড়ার মাঠের কৃষ্ণকলিকে নয়—
বোবা-বেদনার প্রতিমূর্তি
সেই ভীরু লাজুক মেয়েটিকে—
কৃষ্ণকলিরই সহোদরা।

আমার আকাশের পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘমালা
আজ ওর আকাশকে স্পর্শ করবে কি ?
মনে পড়বে কি
জীবনে যাকে পাওয়া গেল না
তারই জন্যে
আকাশের এই আয়োজন ?

গৃহস্থ বাউল

তোমার দেহলিপ্রান্তে কেঁদে কেঁদে কেঁদে
চলে গেল।
একবার ফিরে তাকালে না।

প্রথম দিনের কথা মনে পড়ে আজ।
তোমাদের তকতকে নিকানো উঠোনে
অদ্ভুত মানুষ এল ভিক্ষাঝুলি কাঁধে।
বয়স পঞ্চাশ পার, গেরুয়া বসন,
শতছিন্ন আলখাল্লা তালি-দেওয়া রঙিন সুতোয়।
কোমরে উত্তরী ক'সে বাঁধা,
হাতে একতারা।

কণ্ঠে তার সুর ছিল,
তোমার কিশোরীমনে দোলা দিয়ে গেল!
সেই থেকে শুনি প্রতিদিন
ভিখারি-কণ্ঠের গান তোমাদের আঙিনার কোণে।
গৃহস্থ বাউল,
গান গেয়ে খুশি করে,
ভিক্ষা নিয়ে ঘরে ফিরে যায়।

তারপর কিছুদিন প্রবাসে ছিলাম।
প্রতিবেশিনীর কথা
বৈষয়িক কাজে-কর্মে ভুলেই গিয়েছি।
ফিরে এসে দেখি
দেউড়ির ধাপে ব'সে ভিখারি বাজায় একতারা।

অন্তরঙ্গ আলাপনে অনেক ঘনিষ্ঠ তার সুর।
কোনোদিন রাধাকৃষ্ণলীলা,
কোনোদিন শিব-সংকীর্তন।
বাংলার লোকায়ত প্রাণপ্রবাহিণী
গঙ্গা-যমুনার স্রোতে বাঙালীর পিপাসা মিটায়।
সেই স্রোতে ডুব দিয়ে বাউলের কণ্ঠে জাগে গান।
সংগীত-সমুদ্র-হতে দুটি মূর্তি ভেসে ওঠে প্রাণে :
রাধা আর উমা।
বাংলার ঘরে ঘরে দুই নারী—দুই স্নিগ্ধ নাম।
দুটি নামে দুই রূপ, তবু যেন অপরূপ এক।
মানস-রাধাকে বুকে নিয়ে
শিব-উমা অর্ধনারীশ্বর।

হঠাৎ অবাক হয়ে শুনি
ভিখারির কণ্ঠে ফোটে
তোমার নূতন নাম :
রাধারানী।
বুঝলাম
সাহস বেড়েছে তার,
পেয়েছে প্রশ্রয়।
পল্লীবাসিনীর বুকে বাংলার শাশ্বতা কিশোরী
এসেছে বেরিয়ে।
হাতে তার পূর্ণপাত্র আমার তণ্ডুল।
বাউলের ঝুলি ভরে মাধুকরী ভিক্ষার সুধায়।

তারপর কেটে গেল আরো বহুদিন।
অসমবয়স্ক দুটি মানুষের খেলা

দেখে দেখে দেখে
কৌতূহল হল।
গেলাম মাঠের পারে
ভিখারির গাঁয়ে।
সাধারণ গৃহীর সংসার,
তবু তুচ্ছ নয়,
পুকুরের চারপাড়ে ফুলের বাগান।
টাটকা ফসলে ভরা সবজির খেত।
গোয়ালে ধবলী বাঁধা, সদ্যোজাত বকনা বাছুর।
হাঁস-পায়রা
ছেলেপিলে
প্রৌঢ়া বউড়ী।
নিতান্তই গৃহস্থ সে, নিম্নবিত্ত মানের মানুষ,
অথচ বাউল।
ঘরের খেয়েও তাই বনের পাখির ডাক শোনে,
খুঁজে ফেরে
কোথায় মিলবে তার মনের মানুষ।

তোমার প্রশ্রয় পেয়ে স্পর্ধা তার ক্রমেই বেড়েছে :
রাধারানী একদিন তাই হ'ল রাধে।
রাধে ভিক্ষে দিলে তার পাত্র ওঠে ভ'রে।
নইলে কাঙালপনা কিছুতে ঘোচে না।
এদিকে তোমার চিত্ত দিনে দিনে হারায়েছে রঙ,
ভিখারির বাড়াবাড়ি অসহিষ্ণু করেছে তোমাকে,
প্রশ্রয় দিয়েছ ব'লে অভিমানে জেগেছে যন্ত্রণা।

অবশেষে এল শেষদিন।
অন্নদামঙ্গল পালা ছিল তার সেদিনের গানের বিষয়।

ভিখারি মহেশ
কৃতাঞ্জলিবদ্ধ হয়ে কৃপাপ্রার্থী রয়েছে দাঁড়িয়ে।
অন্নপূর্ণা বুভুক্ষা মেটাবে।
ঠাকুরসেবার কাজে সেদিন সারাটা বেলা তুমি ব্যস্ত ছিলে।
দেউড়ির ধাপে ব'সে ভিখারির গান শেষ হ'ল।
তারপর প্রতীক্ষার পালা,
পূর্ণপাত্র হাতে নিয়ে দেখা দেবে তার রাধারানী।

তোমার সময় নেই,
গৃহদেবতার ভোগ পায়সান্ন চড়েছে উনোনে।
জুঁইকুঁড়ি বাসমতি চালের সুবাসে
আমোদিত হয়েছে আঙিনা।
আগন্তুক ভিখারি বাউল
ব'সে আছে উৎকণ্ঠ দুরাশার দুর্লভ আশায়।
হঠাৎ তোমাকে দেখা গেল,
গৃহদেবতার ভোগ পূর্ণপাত্র পায়সান্ন নিয়ে
মন্দিরে যাবার পথে এসেছ বেরিয়ে।
ভিখারির কম্প্রকণ্ঠে শোনা গেল প্রার্থনার ভাষা :
'ভোগের প্রসাদ পাব রাধে?'
অকস্মাৎ কী যে ঘটে গেল।...
তড়িৎস্ফুলিঙ্গের মতো দুটি চোখে ক্রোধাগ্নি জ্বালিয়ে
একবার ওর দিকে তাকালে আক্রোশে।
মুহূর্তে ফেরালে মুখ পরম ঘৃণায়।
পূর্ণপাত্র পায়সান্ন ছুঁড়ে ফেলে দিলে আঁস্তাকুড়ে।

অন্ত্যজের লালসাদৃষ্টিতে
ইষ্টদেবতার ভোগ হয়েছে অশুচি।

কালের কড়চা : ১৯৭০

হাঁটুতে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা, খোঁড়া পায়ে চলেছে সময়।

পৃথিবীর আদিম জঙ্গলে
নেমেছে শীতের সন্ধ্যা,
কুয়াশায় ঢেকে গেছে পথ।

ছেঁড়া ইতিহাসের পাতায়
অঢেল পেট্রল ঢেলে
বেপরোয়া যুবকের দল
বিপ্লবের আগুন পোহায়।

সে আগুনে পুড়ে ছাই রূপকথার ক্ষীরের পুতুল।

কালের কড়চা : ১৯৭১

মার্কিনপন্থা

মদীয়া মার্কিনপন্থী—
বন্যায় ডুবিয়ে দেশ যেছোহাটা ইলিশে ভাসায়।

অথৈ দরিয়া

বড্ডোই বেড়েছে বাড়—
অতএব লাথ লাথ করেছ সাবাড়।
তবু ইয়াহিয়া
হালেতে পেলে না পানি,
বাংলাদেশ অথৈ দরিয়া।

ভণ্ডরাজ

যাও তুং সিকিয়াং
চৌ এন লিখিয়াং।
নিকসন যাইলাই
চীন-কিন ভাই ভাই।

আফ্রিকা এশিয়ার
দুশমন হুঁশিয়ার।
পিকিঙের পিংপং
ডিংডং ডিংডং।

শরণাগত

তারপরে একদিন এল তা'রা রাতের আঁধারে—
আতঙ্কিত প্রাণ নিয়ে পার হয়ে এল দীর্ঘপথ ;
বহু মাঠ, বহু নদী, বহু হিংস্র শত্রুর শপথ,—
বহু মৃত্যু পার হয়ে এল তা'রা মানুষের দ্বারে।
তা'রাও মানুষ ছিল, একদিন তাদেরো সংসারে
প্রিয়চোখে প্রেম ছিল, প্রাণে ছিল স্বপ্ন সুমহৎ,
গর্বের অতীত ছিল, আশাদীপ্ত ছিল ভবিষ্যৎ,—
ভালো তা'রা বেসেছিল মানুষেরি প্রিয়দেবতারে।

হঠাৎ তাদের চোখে আকাশের সূর্য গেল নিভে,
অন্ধকারে ছুটে এল নরঘাতী দানব-বাহিনী,
জিঘাংসায় উল্লসিত শুরু হ'ল বীভৎস কাহিনী,—
জীবনের অশ্রুকুণ্ড পূর্ণ হ'ল শবে আর শিবে।
সেই মৃত্যু পার হয়ে প্রাণে নিয়ে মুক্তি-কাতরতা
প্রেতের প্রদেশ থেকে পরাভূত এল মানবতা।

সবাই যে যার ঘরে

সবাই যে যার ঘরে!

নিজের পুতুল নিয়ে,
অথবা পুতুল হয়ে অন্য কারো হাতে
দিব্যি শুয়ে আছে।

আগুন লেগেছে কোথা?
পুবের আকাশ জুড়ে কা'রা কাঁদে,
কা'রা যেন হাহাকার করে!
পশ্চিমের ভিটে-মাটি বসত-খামার
প্রলয়-বন্যায় বুঝি ভেসে গেল!

কত লাখ এল ওরা?
পায়ে পায়ে আরো কত লাখ
আসছে কে জানে!

হে মোর দুর্ভাগা দেশ!...
এই ভেবে
বোবা-কান্না কেঁদে
সবাই যে যার ঘরে
নিজের পুতুল নিয়ে
অথবা পুতুল হয়ে অন্য কারো হাতে
পাশ ফিরে শোয়।

সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে

'সিংহের ঔরসে
শৃগাল কি পাপে মোরা. কে ক'বে আমারে ?'—
কবিপুরুষের শঙ্খে এ আত্মধিক্কার
আবার সোচ্চার হ'ল নিরালোক কালের ফলকে।
পশ্চিম দিগন্ত জুড়ে নৈরাশ্যের বিবর্ণ প্রহরে
সন্ত্রাসের বিভীষিকা নামে।
মৃত্যুভীত কাপুরুষ
বিতাড়িত পশুর মতন
ক্লীবের সম্বল নিয়ে স্বার্থপর বিবরে লুকায়।
শ্মশানে উৎসব করে প্রলয়ের ধূর্ত ফেরুপাল।

ওরি মাঝে অকস্মাৎ পূর্বাশার সিংহদ্বার থেকে
ভেসে আসে জয়ধ্বনি নবজীবনের।
· ·আমার সোনার বাংলা···
মাতৃমন্ত্র কণ্ঠে নিয়ে জেগেছে নবীন বাংলাদেশ।
মুক্তি চাই
স্বাধীনতা চাই
আত্মতন্ত্রে বাঙালীর সহজাত স্বাধিকার চাই।

শাসিতের শোষিতের এই দৃপ্ত আত্মঘোষণায়
বেসামাল সামরিক শাসকের দল
মর্টারে মেশিনগানে
কামানে বিমানে
নগরে বন্দরে গঞ্জে
ছড়ায় ত্রাসের বিভীষিকা।

অগণিত শহীদের রক্তধারা
বয়ে যায় পদ্মায় মেঘনায়।
অবিরল জনস্রোত রাজপথে রাজপথে
পার হয় পৈশাচিক প্রেতের প্রদেশ।

মুমূর্ষুর আর্তনাদ,
শোকার্তের করুণ ক্রন্দন,
ভূতল-গগন-মূর্ছিত-বিহ্বল-করা
মরণে মরণে আলিঙ্গন,
ওরি মাঝে পথ চিরে চিরে
নূতন সমুদ্রতীরে
ওই বীর যুবকের দল
কী মন্ত্রে ভুলেছে মৃত্যুভয়!

এপারে নেমেছে সন্ধ্যা,
পূর্বপারে অভিশপ্ত রাত হয় শেষ
সপ্তকোটি কণ্ঠে জাগে প্রভাতের শুভবৈতালিক—
…আমার সোনার বাংলা…
এই নবজন্মলগ্নে
সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে
দেখেছি দু'চোখ ভ'রে সিংহশিশু জেগেছে আবার,
জয় হোক্ তার।
জয় হোক্ বাঙালীর,
ওই নবজাতকের।
ওই চিরঞ্জীবিতের।

আগস্ট ১৯৭১

উত্তীর্ণ গোধূলি

বিদ্যুৎ-অধরে
আমাকে ছুঁয়েছ তুমি।
আমি বৈশাখের মেঘ জলভারনত,
আমাকে বিদীর্ণ কর সহস্র ধারায়।
মর্তের আশ্লেষ-তৃষা
তৃপ্ত হোক্
আকাশ-সংগমে।

প্রেয়সী

রবীন্দ্রনাথের মতো প্রেমস্বপ্ন আমিও দেখেছি—
ময়নাপাড়ার মাঠে কৃষ্ণকলি হরিণনয়ন,
নবীন শ্যামল দেহে তমালের কালো কোমলতা
এনেছে বিনিদ্র রাতে আষাঢ়ের মেদুর বিরহ।
প্রেমের অমরাবতী উজ্জয়িনী নীবিমোক্ষ-ধাম,
সেখানে শিপ্রার তটে প্রেয়সীর সংকেত-ভবন,
মুখে-মাখা লোধ্ররেণু, লীলাপদ্ম হাতে মালবিকা
মণিদীপদীপ্ত কক্ষে হাত ধ'রে ডেকেছে আমায়।

রবীন্দ্রনাথের মতো প্রেমস্বপ্ন আমিও দেখেছি—
আমারো যৌবন-স্বপ্নে ছেয়েছিল বিশ্বের আকাশ,
তবু স্বপ্ন সত্য নয়, রূঢ় রুক্ষ বাস্তব জীবন,
প্রতি পদে চূর্ণ হয় গজমোতি-মিনারবিলাস।
মধ্যবিত্ত গৃহস্থের দৈনন্দিন জীবন-সংগ্রামে
যে এল সঙ্গিনী হতে, আজন্মের মানসী আমার,
অশোক রাজত্ব হাতে রাজকন্যা মধুমালা নয়,
আমারি দোসর সে যে মধ্যবিত্ত-গৃহস্থদুহিতা।

শিশুকালে নদীকূলে সচন্দন পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে
শিবমূর্তি পূজা ক'রে আমাকে সে করেনি কামনা;
পল্লীর দুলালী নয়, শহরের পাষাণ-প্রাচীরে
বেড়েছে আড়ষ্ট প্রাণ নাগরিক কৃত্রিম রসদে।
যৌবন এসেছে দেহে কুমারীর অপরাধ হয়ে,
সলজ্জ সংকোচভরে ফ্রক ছেড়ে জড়ায়েছে শাড়ি;
শহরের পথ বেয়ে ঘুরেছে সে ইস্কুল-কলেজে,
শিখেছে ইংরেজি-বিদ্যা শেষ অস্ত্র জীবন-সংগ্রামে।

তারপর একদিন উৎসবের বাঁশরী সংগীতে
বেণী সুসংবদ্ধ ক'রে শিরে টেনে দিয়েছে গুণ্ঠন,
মঙ্গল-সিন্দুরবিন্দু পরেছে সে সীমন্ত-সীমায়—
এসেছে জীবনলক্ষ্মী লক্ষ্মীছাড়া মধ্যবিত্ত ঘরে।
প্রণয়-মিলন-রাতে সলজ্জিত বাসর-শয্যাতে
কানে-কানে-ডাকা নাম কাব্য হতে এল না স্মরণে,
'প্রেয়সী' অথবা 'প্রিয়ে'—মনে হ'ল অসহ্য ন্যাকামি,—
সম্বোধন শুধু নয়, দাম্পত্যেরো নব-ইতিহাস।

কম্পিত সমাজবুকে শাখাশ্রয়ী স্বল্পপরিসরে
ভূমিসংস্রবহীন পরাশ্রিত প্রাণ আমাদের,
দুর্দান্তের ঝড় এলে উন্মূলিত শূন্যে যাব উড়ে
'কিংবা ভাগ্য ভালো হলে ফিরে পাব মাটির আশ্রয়।
আপাতত ভাড়া-করা দেড়তলা ফ্ল্যাটের ভাড়াটে,
দু'খান সংকীর্ণ ঘরে শুরু হয় সাধের জীবন ,—
উদয়াস্ত পরিশ্রমে অস্তিত্বের প্রাণান্ত সংগ্রাম,
জীবিকার অন্বেষণে তিলে তিলে জীবনের ক্ষয়।

অচল সংসারযাত্রা টেনে টেনে নাভিশ্বাস ওঠে,
অবশেষে রাজপথে আব্রুহীন শুদ্ধান্তচারিণী,
আপিসে কেরানি সেজে গৃহলক্ষ্মী চালায় সংসার,—
দুজনের উপার্জনে কোনক্রমে জীবধর্ম চলে।
অভাবে স্বভাব নষ্ট, খ'সে পড়ে বনেদি মুখোশ,
ক্রমশ ধাতস্থ হয় অন্ত্যজের অভদ্র জীবন.
ধনিক-বন্ধুর কাছে নিতে হয় করুণার দান—
জানি তা দাদন মাত্র বশংবদ শিকারের লোভে।

ইংরেজি কেতাবে শেখা স্বাধীনতা হয় স্বেচ্ছাচারী—
চিরকেলে সেবাদাসী দিনে দিনে স্বাধীন-জেনানা ;

আবার বর্বর রক্তে জেগে ওঠে আদিম পুরুষ,
তাকে আমি শান্ত রাখি সভ্যতার সাবধান প'ড়ে।
সন্দীপের মোহাকর্ষে উৎকেন্দ্রিতা আমার বিমলা,
আমি নিখিলেশ-শিষ্য, বন্দিনীর খুলেছি শৃঙ্খল ;
আমার বুর্জোয়া-তন্ত্রে উমা আর রাধার মিলন,
গৃহে বৃন্দাবন র'চে আমি করি প্রেমের বিলাস।

'পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যা' আমাদের অনাচরণীয়,—
অব্যাহত জীবলীলা দরিদ্রের ঘরে অভিশাপ,
জন্মনিয়ন্ত্রণে তাই দীক্ষা নিয়ে পাশ্চাত্য গুরুর
নিশ্চিন্ত আরামে চলে নিশীথের তমিস্র-বিলাস।
তবু চোখে অশ্রু নামে, কান্না শুনি ভাবী জাতকের,
আমার রক্তের মাঝে শুনি তার জন্মের প্রার্থনা,
দাম্পত্য-মিলনে কাঁদে মানুষের ভাবী বংশধর,
তবু তার মুক্তিপথ অবরুদ্ধ আমাদের পাপে।

যে-অটল ভিত্তিমূলে সভ্যতার শাশ্বত আশ্রয়
আজ দেখি সে-ভিত্তির চোরাবালি ধ্ব'সে ধ্ব'সে পড়ে,
যে-সুন্দর সৌধতলে স্বপ্ন ছিল পূর্বপুরুষের
বিবর্ণ সে সৌধগাত্রে পঞ্জরাস্থি পড়েছে বেরিয়ে।
অতীত হয়েছে মিথ্যা, ভবিষ্যৎ দূর-মরীচিকা,
ভূত-ভবিষ্যৎ-হারা অট্টহাসি আমরা সৃষ্টির ;
মগজের আভিজাত্যে ঘৃণা করি ইতর মজুরে,
কাঙাল নয়নে চাই ঊর্ধ্বমুখে ধনীর প্রাসাদে।

তবু মনে স্বপ্ন নামে বাস্তহারা মধ্যবিত্ত ঘরে,
স্বপ্ন নামে শ্রান্ত চোখে, স্বপ্ন নামে ক্লান্ত ওষ্ঠাধরে,
সৃষ্টির প্রবাহ বেয়ে স্বপ্ন নামে নিস্তেজ শিরায়,
একই জীর্ণ শয্যাপ্রান্তে স্বপ্ন নামে দুটি শীর্ণ দেহে।

জানি বন্ধ্যা, তবু সেই অভিশপ্ত স্বপ্ন দেখে দেখে
ব্যর্থ এ জীবনযুদ্ধে উভয়েরই এক পরিণাম—
আসন্ন ধ্বংসের মুখে সহযাত্রী মরণ-সঙ্গিনী,
প্রলয়ের অন্ধকারে কণ্ঠলগ্না আমার প্রেয়সী।

অনুচ্চারিত

এস্‌প্ল্যানেডের মোড়ে থেমে গেল ডবল-ডেকার,—
নব-অনুরাগবতী পাশে ব'সে ছিলে একাসনে ;
সম্মুখ-যুবার চোখে নগ্নক্ষুধা রমণী দেখায়,—
তোমার অলস্ত ঘৃণা ফুটিয়াছে কটাক্ষ-শাসনে ।

বাঁ-দিকে গড়ের মাঠ, ডানদিকে চৌরঙ্গির ভিড়,
তার মাঝে তুমি-আমি পাশাপাশি ব'সে মৌনমুখ ;—
মন কি আকাশে ওড়ে, অথবা সে গড়ে স্বপ্ননীড়,
ফোটে কি হৃদয়-পদ্ম, কণ্ঠ তবে কেন থাকে মূক ?

ভিক্ষাপাত্র তুলে ধরে ভিক্ষা চায় ভিখারী-বালিকা,—
'একটি আধ্‌লা দে মা !'—অঙ্গে তার মূর্ত অনশন ;
ধনীর লাঞ্ছনা দিয়ে রচা তার ম্লান দৃষ্টিশিখা,
বঞ্চনার গূঢ়ফণা কণ্ঠ তার করিছে দংশন ।

মায়ের না পেয়ে দয়া ফিরালো সে মোর পানে চোখ,
ক'হল কাতর কণ্ঠে, 'দে না বাবা !'—দুটি মাত্র কথা ,
কিন্তু এ কি বলিল সে ! মিলনের এ কি নবশ্লোক !
দুটি মাত্র সম্বোধনে উচ্চারিত ভবিষ্য-বারতা !

অকস্মাৎ কি যে হ'ল, নতমুখে হাতব্যাগ খুলি'
পশ্চাতে ফেলিলে ছুঁড়ে ভিক্ষাপাত্রে একটি আধুলি ।

স্বপ্নো নু মায়া নু

রাত্রিশেষে স্বপ্ন দেখি : কেলিকুঞ্জে মাধব-রাধিকা,—
অভিসারে এল প্রিয়া, প্রিয়তম কুসুম-শয়নে
বঁধুর আদর-লোভী নিদ্রা আনে কপটী-নয়নে,
গোপন চুম্বন-চৌর্যে ধরা পড়ে বক্ষে প্রাণাধিকা।
—কোথা রাধা, কৃষ্ণ কোথা! তুমি মোর উত্তরসাধিকা
বক্ষে এলে নবকান্তি মিলনের আনন্দ চয়নে,
সব-সমর্পণ-ব্রত পূর্ণ করি' পুণ্য প্রেমায়নে
দুই হাতে দুই স্বর্গ দিলে তুলে মৌন-আরাধিকা।

মনে হ'ল আমি আজ বাসবেরো চেয়ে ভাগ্যবান—
যে সুধায় অমরত্ব ওষ্ঠাধরে আছে সেই সুধা,
প্রেমপাত্রে পান করি মধুকণ্ঠ আমি মৃত্যুঞ্জয় ;
কোথা মুক্তি মুমুক্ষুর ? ভক্ত-আশা কোথা ভগবান ?
দুই বাহু প্রসারিয়া বেড়িয়াছে আমারে বসুধা,
এ বন্ধন স্বপ্ন যদি, যদি মায়া, তারি হোক জয়।

প্রেম : হাজার বছর আগে

গুহ্য মণিকুম্ভিম পেরিয়ে
রক্তবেদী।
সেখানে সুষুপ্তিলীনা কুলকুণ্ডলিনী
মহামোহে তমোনিমগন।
ওগো নৈরামণি,
তন্তুতন্ত্রী স্বৈরিণীকে বেঁধে নিয়ে যাও
মুক্তদল শীর্ষ-সহস্রারে।

আমি মহাসুখবাদী সহজসাধক।
পঙ্কস্কন্ধ-বিরহিত
শূন্যতার বুকে
রতিরসে সুরভিত তোমার মিলন
নিঃশ্রেয়স উপাস্য আমার।

কমলের মর্মকোষ
বিদ্ধ হোক্
নিষ্ঠুর কুলিশে।
এসো
মোরা পান করি সংজ্ঞাহীন নির্বাণের মধু।

অনুপমা

বিরহী যক্ষের চোখে
প্রেয়সীর কমনীয় তনু
বিধাতার আদিসৃষ্টি।
বাসনা সেখানে নিঃশ্বসনা।

চারুশীলিত কবিমানসে
ওই দেহ সুন্দরের মধুমালঞ্চ।
পুষ্পস্তবকে অবনম্র
সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতা—
বিধাতার শেষসৃষ্টি।

আকাশ-ভুবনের সমস্ত উপমান নিঃশেষিত
তবুও সে অনুপমা।

মিলনের গান

যেখানে সীমার সাথে অসীমের কানাকানি কথা,
পৃথিবীর হাতখানি হাতে নিয়ে আকাশ নীরব,
রামধনু রঙ বুনে কে যেন পরায়ে দেয় রাখী।

তোমার কমল-কর রেখেছ আমার করতলে॥

যেদিন পূর্ণিমা-রাতে চাঁদের কিরণ হয় সুধা,
সমুদ্র সহস্র বাহু ঊর্ধ্বে তোলে পরশ-তৃষায়,
জ্যোৎস্নার শিহর ঝরে তরঙ্গের কুহরে কুহরে।

তোমার কমল-কর পেয়েছি আমার করতলে॥

বসন্তের পুষ্পবন পথ চায় কার প্রতীক্ষায়,
দক্ষিণ সমীর এসে সারা দেহে বুলায় আদর,
সেই মধুস্পর্শ পেয়ে কুঁড়িগুলি ফুল হয়ে ফোটে।

তোমার কমল-কর মিলেছে আমার করতলে॥

সমুদ্রগামী নাবিকের প্রার্থনা

অন্ধকারে দুটি ফুল হাতের মুঠোয় নিয়ে
কার পূজা করেছি জানি না—
সে কি প্রেম ? সে কি নারী ? অথবা সে দেহধারী
আত্মরত বাসনা আমার ?
স্বর্গ আছে কি না আছে,—তুমি আছ আমি আছি,
তার বেশি কিছু তো মানি না ;
ওই পুষ্পতনুখানি—কখনো গলার মালা,
কখনো সে অর্ঘে পাথার।

"...সে যখন ঘুম ভেঙে আমার বুকের পাশে শুয়ে আমার মুখের দিকে পলকহীন চোখে তাকিয়ে থাকে তখন এক অনাস্বাদিত মধুর লজ্জায় আমি চোখ মেলতে পারিনে। চোখ বুজে বুজেই তার দৃষ্টির স্পর্শ দেহের অণুতে অণুতে অনুভব করি। সুধামাখা আদরের মতো সে দৃষ্টি। সে যেন প্রথম দিনের দেখা। চির-অতৃপ্ত, চির-পিপাসিত।

"দক্ষিণের জানালায় নিশান্তের আলো যখন চামেলির মতো ফুটে ওঠে,—রূপ নয়, রূপের লাবণ্য যখন যুগলের মিলনস্বর্গে মায়ামালঞ্চ রচনা করে, তখন আমি চুরি ক'রে ক'রে ওর দিকে তাকাই। দেখতে পাই নিশান্তের দুটি শুকতারা জ্বল্‌জ্বল্‌ করছে ওর চোখে। শিশুর মতো কোমল তার মুখখানি। অসহায়। কী এক অব্যক্ত প্রার্থনায় নিঃসম্বল প্রার্থীর নিঃসহায়তা নিয়ে ব'সে আছে। আমার বুক কেমন করতে থাকে। না বন্ধু, লজ্জা নয়, ঘৃণা নয়, বাসনা-সুবাসিত আনন্দও নয়। পুলকিত রোমাঞ্চের শিহরণে কেমন যেন দুরুদুরু গুরুগুরু রক্তের স্পন্দন!

"প্রিয়বন্ধু, তুমি তো জান, যাকে ভালবেসেছিলাম সেই আজ আমার জীবনের দোসর। আমার সুখ-দুঃখের নিত্যসঙ্গী। সর্বস্ব তো উজাড় করে বিলিয়ে দিয়েছি তাকে। আমার বলতে তো আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। আমাকে সে পৌরুষের প্রমত্ত আবেগে জয় করেছে। আমার সমস্ত গর্বকে। সমস্ত

নারী-অভিমানকে। ও যখন দিগ্‌বিজয়ী বীরের মতো ওর বলিষ্ঠ বাহুতে আমাকে জয় ক'রে নেয় তখন ওর বনস্পতিবিশাল বুকে নিজেকে ছোট্ট একটি পাখির মতো মনে হয়। রক্তকরবীর সেই পাখি!

"কিন্তু রাত্রিশেষের স্বপ্নদেখা আলোয় ও যখন ভিখারীর কাতরতায় আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে, তখন নিজেকে মনে হয় রাজরাজেশ্বরী। আমার ভিখারী আমাকে চাইছে।

"না বন্ধু, এ মিলনের আনন্দ নয়। প্রতি অঙ্গের জন্যে প্রতি অঙ্গের ক্রন্দনও এ নয়। ভোরের সেই চামেলি-আলোয় মায়ামালঞ্চে আমার সারা দেহ ফুল হয়ে প্রিয়তমের চোখের আলোয় ফুটতে থাকে। নিজের সত্তায় সেই পুষ্পবিকাশের আনন্দ তোমাকে কী করে বোঝাব বল? কুমারীর অমরাবতীতে সে ফুলের নাম জানা নেই।"

কাল রাতে

রক্তহীন অন্ধকারে
মাঝদরিয়ার বুকে হাল-ভাঙা নাবিক দেখো নি ?
তাহলে আমার দিকে চাও।
কাল রাতে আমি সেই মৃত্যুভীত নাবিক ছিলাম।

আকাশে ছিল না তারা,
সমুদ্রের বুকে ছিল ঝড়,
উত্তাল ঢেউয়ের মুখে তরীখানি ছিল অসহায়।
বিনাশের বিভীষিকা হিংস্র শ্বাপদ হয়ে
আমাকে কবলে পুরেছিল,
বুকে ছিল দিশাহারা ভুকভুক মৃত্যুর ইশারা।
প্রেতায়িত চেতনায় একটি মুমূর্ষু শিখা
আলেয়ার মতো ছিল জেগে—
কখন তলিয়ে যাব নিঃসীম অতলে,
কখন আসবে নেমে শেষ সর্বনাশ !

রক্তহীন অন্ধকারে
মাঝদরিয়ার বুকে হাল-ভাঙা নাবিক দেখো নি ?
তাহলে আমার দিকে চাও।
কাল রাতে আমি সেই মৃত্যুভীত নাবিক ছিলাম।

অভিশপ্ত

নিমতলায়
রবীন্দ্রনাথের কোলে তোমাকে শুইয়ে দিয়েছিলুম।
লকলক্‌ আগুনের শিখায়
তোমার মুখখানি আর দেখতে পেলুম না।

গঙ্গাজলের সাথে চোখের জল মিশে
শ্মশানের মাটি শীতল হ'ল।

মহালয়ার তর্পণ শেষ ক'রে গৃহীরা ফিরেছে ঘরে।
পিতৃপুরুষের আশীর্বাদ পেয়েছে তারা।
আমি অভিশপ্ত পিতা
ঘরে ফিরেছি।
সেখানে আর কোনদিন তোমাকে দেখতে পাব না।

একটি হরিণশিশু

আমার চেতনারণ্যে
একটি হরিণশিশু
রাতদিন ঘোরাফেরা করে।
চোখে তার ছলছল বিষণ্ণ করুণা
কানে তার উচ্চকিত স্পর্শভীরু হাওয়া
চঞ্চল চরণে তার দ্রুততাল নিত্যপলায়নী।

আমার চেতনারণ্যে
একটি হরিণশিশু
রাতদিন ঘোরাফেরা করে।
দিনের প্রহর কাটে শ্যামল কোমল তৃণদলে,
রাতের প্রহর তাকে কোলে নিয়ে বিবশ বিভোর।
মায়াবিনী মায়াপাশে অনুক্ষণ আমাকে ভুলায়,—
দিন কাটে রাত কাটে তারি মোহে তারি ছলনায়

মাধবীলতা ও কল্পলতা

বল তো কবে
আমার মাধবীলতা আকাশ ছোঁবে।
কচি কাঁচ দলগুলি শ্যামল কোমল,
বাতাসের দোলনায় দোলে হিন্দোল,
কুসুমের মাসে তার ফুলের ফসল
স্বর্গের সৌরভে ধন্য হবে।

বল তো কবে
আমার কল্পলতা পৃথিবী ছোঁবে।
স্বপ্নের দর্পণে পুষ্পতনু,
শাওন মেঘের বুকে ইন্দ্রধনু,
স্বর্গের সুরধুনী পুণ্যতোয়া
মর্ত্যের পিপাসায় পূর্ণ হবে।

উত্তরণ

একদিন কিশোরীর মুখে
ফুটেছিল ফুলের হাসিটি।
স্বপ্নে আর জাগরণে
নূতন আকাশ ছিল চোখের তারায়।

তারপর
প্রাণের দোসর হ'ল
দূরযানী দুরন্ত যৌবন।

কত ঝড় এল
কত ঝড় দিগন্তে মিলালো।

আলোকে আঁধারে
অনেক দুর্গম পথ পার হয়ে
পার হয়ে হয়ে
আজ তুমি অমলিন অশ্রুর প্রতিমা।

চতুর্থীর শশিকলা

চতুর্থীর শশিকলা উঠেছে আকাশে,
নীলিমাকে নীল করে হাসে।
দেহখানি তার
অদৃশ্য গুণীর হাতে সুরবাঁধা অপূর্ব সেতার।
নিয়ত ঝংকার ওঠে, নিয়ত স্পন্দন;
সংগীতের সুধা তার হাসি ও ক্রন্দন।

একদিন ওই চাঁদ পূর্ণ হবে ষোড়শ কলায়;—
সেদিন মর্তের প্রান্তে কবিমহলায়
তোমাকে চঞ্চল হবে প্রেমিকের প্রাণ,
নবছন্দে গাঁথা হবে ষোড়শীর নবস্তবগান।
সেদিন কোথায় আমি, কোথা মোর ভাষা—
হায় রে দুরাশা!…
তবু ওই প্রীতিপারমিতা
আমারি কবিতা।
যদিও বা কালোত্তীর্ণ কবি—
আমারি কল্পনা ও যে, আমারি বাসবী।

অস্তভনী

যে-যুগের নারী
মহাশূন্যে ভেসে যায় পৃথিবীর সীমানা পেরিয়ে
সে-যুগের ভাষা চোখে নিয়ে
এসেছে সে।
ভালোবেসে
পাবে না নাগাল তার।
বিধাতার
সৌন্দর্যের বুঝি শেষ সীমা।
বিপ্রলব্ধ বেদনায় আমি তাকে চিনি
মোহিনীর মায়ামূর্তি বিশ্ববিজয়িনী।

হে বীর, গাণ্ডীব তোল

অর্জুনের মহাশঙ্খ
দেবদত্ত,
বীরের আহ্বান তুমি,
তুমিই অর্জুন।

সসাগরা বসুন্ধরা বিজয়ের যোগ্য ভূমি নয়,
দিগ্‌বিজয়ী পুরুষেরা ইতিহাসে বিলুপ্ত-পুরাণ।
আরো এক বিশ্ব আছে—
বিশাল মানববিশ্ব দুর্গম দুর্জয়।
অপরাজিত প্রেমে জয় করো সে-বিশ্বহৃদয়।

জীবনের কুরুক্ষেত্রে
জয়ের তিলক প'রে,
ধনঞ্জয়,
সায়াহ্নের ভাস্মপথে এসো।
শরশয্যাশায়ী পিতামহ—
রণক্লান্ত ওষ্ঠাধর প্রাণতীর্থে পিপাসাপাতুর।

হে বীর,
গাণ্ডীব তোল।
অতল পাতাল থেকে
উৎসারিত করো প্রাণধারা।
তোমার অমিত বীর্যে
মুক্ত হোক তৃষ্ণার নির্ঝর।

মোনালিসা

বল্লরী বল্লভী হবে কার—
তোমার ? আমার ?
অথবা সে রূপকথার রাজার কুমার ?

খেলার সাথীরা তার খেলার পুতুল—
মিতুন ভুতুল।
বলবে না কিছুতেই সবচেয়ে কাকে ভালোবাসে।
চোখে টেনে প্রহেলিকা, বাঁকা-ঠোঁটে মোনালিসা হাসে।

সেই নদী

'বলাকা'র নদীটিকে তোমরা দেখেছ।—
অদৃশ্য নিঃশব্দ তার জল
অবিচ্ছিন্ন অবিরল
চলে নিরবধি।
ভৈরবী সে, বৈরাগিণী—
মহাকাল-সহচরী
সৃষ্টি-মন্দাকিনী।

আরো এক নদী আছে—
বাংলার বুকের দুলালী।
নদীয়ার ঘরে ঘরে
খেলা করে।
নাচে গায়,
পিপাসা মেটায়।

সেই নদী শিশু হয়ে হাসে
আমার মায়ের কোলে।
সেই নদী প্রাণপ্রবাহিণী।
সেই শিশু প্রেমের রাগিণী।

আয়ত-বিশাল চোখে

আয়ত-বিশাল চোখে কী বার্তা এনেছে ওই শিশু
মাটিকে সে ছুঁয়ে আছে তবু যেন এ-মাটির নয়।
আরো এক আকাশের অপার বিস্ময়
চোখে তার।
সে আমার
অতৃপ্ত পিপাসা আর অকৃতার্থ সাধনার ধন,
নবরূপে অরূপ-রতন।

ফুলের পুতুল

অঙ্গের লাবণি

ঢলঢল।

মুখে আধো-আধো ভাষা অমৃত-সমান,

চোখ-দুটি দুষ্টুমির শিখায় মুখর।

একরাশ ফুলের শরীর।

সুন্দরীর

সুধা ঝরে হাসিতে বাঁশিতে।

গৈরিক মেঘের পতাকায়

গৈরিক মেঘের পতাকায়
ভোরের আকাশ
শরতের বার্তা দিয়ে গেল।

কাল সন্ধ্যাবেলা
চাপা কান্না ছিল বুক জুড়ে।
মাঝরাতে
জননীকে ভাসিয়ে চোখের জলে
জাতকের প্রথম কান্নায়
ঘর ভেসে গেল।

'জয় বাংলা' কণ্ঠে নিয়ে
নতুন যুগের বীর
জন্ম নিল আমাদের ঘরে।

যন্ত্রণা

অনন্ত মৃত্যুর মুখে তৃষাতুর দু'বাহু বাড়ায়ে
নিরালোক অন্ধকারে বার বার খোঁজে সে তোমাকে।

জন্মান্তর-স্মরণিকা তুমি,
সুরভিত স্বপ্নের প্রতিমা।
মর্তের মানবী হয়ে ধরা দাও পুরুষের বুকে,
সৃষ্টির রহস্য কাঁপে থরোথরো সমুদ্র-মন্থনে।

প্রাণযজ্ঞে
মরণের আবরণ খুলে
মৃৎপাত্রে অমৃত-প্রাশন।

অন্ধকার-গোষ্ঠ হতে গোধূলির ধেনুগুলি
উষার আকাশে ফিরে আসে।
কুহকিনী রাতের কাজল
মুছে যায় আলোকিত দিনের গভীরে।

তবু রক্তে জেগে থাকে জন্মান্তর জীবনের জ্বালা।

দীপবৃক্ষ

'আমাকে কবিতা কর তোমার প্রেমের',
বলেছিল প্রেমময়ী নারী।
'ভুজবন্ধে তুলে ধর পৃথুলা এ পৃথ্বীতল থেকে,
আকাশ-আলোর সাথে আমাকে মেলাও।'

গলায় প্রেমের মালা নিয়ে
শিহরিত আবেগে আবেশে
বলেছিল প্রেমিক পুরুষ,
'আমাকে দোসর কর তোমার দেহের।'

সেতুবন্ধে পার হয়ে স্বজনের অপার বিরহ
কর্ণমূলে ওষ্ঠাধর রেখে
বলেছিল—
'আমার সাবিত্রী তুমি,
বসুধার দীপবৃক্ষে জ্যোতির্ময়ী আলোকের শিখা,
আমাকে তোমার কবি কর।'

একদিন তুমি বলেছিলে

একদিন তুমি বলেছিলে,
আলোটা নেভাও।

তারপর
কত দিন কত রাত পার হয়ে গেল।
তারাভরা দুটি চোখ থেকে
কত আলো
অশ্রুজলে হ'ল রামধনু।

কখনো বর্ষার ঝড়ে নিভে গেছে আকাশপ্রদীপ,
শীতের কুয়াশা এসে
নতুন ভোরের আলো ম্লান ক'রে গেছে।

আজ প্রৌঢ় বেদনায়
হাসিকান্না মহাশূন্যে ভাসে।
আলো নেভে
অন্ধকারও নেভে।

শুধু দুটি তারাভরা চোখে
আরো এক জীবনের আলো
শান্তরশ্মি মণিদীপে জ্বলে।

উত্তীর্ণ গোধূলি

কুয়াশার শাদা পশমে মুখ ঢেকেছে শীতের সন্ধ্যা,
দূরের পথ দৃষ্টিসীমার বাইরে।
উৎকণ্ঠ প্রতীক্ষার তমিস্রাভেদী আলো জালিয়ে
পথ চেয়ে আছি—
কখন অন্ধকার নড়ে উঠবে,
ধীরে ধীরে বেরিয়ে আসবে একটি ক্লান্ত করুণ মূর্তি,
আসবে তুমি।

কবি বলেছেন :
'আমার গোধূলি-লগন এলো বুঝি কাছে
গোধূলি-লগন রে,
বিবাহের রঙে রাঙা হয়ে ওঠে
সোনার গগন রে!—'
আমাদের গোধূলি-লগ্ন
বিবাহের রঙে রাঙা হয়ে ওঠে না।
সারাদিনের প্রাণান্ত পরিশ্রমে
সারাদেহের রক্ত উঠে আসে মুখে—
ওরি নাম সূর্যাস্ত।

আকাশে শুক্লা-সপ্তমীর শশিকলা,
তারার চুমকি-দেওয়া ইস্পাত-নীল ওড়নায়
মুখের আধখানি ঢাকা।
মর্তলোকে সহস্র দীপ অন্ধকারসমুদ্রে ভাসমান।
এই তো তোমার ঘরে ফেরার লগ্ন।

তুমি আর আমি জন্ম দিয়েছিলাম
একটি শিশুকে—
ইহলোকে তার নাম প্রেম।
তারি মাঝে দুজনে গড়েছি নীড়।
সে নীড়ের বুকে লেগেছে কালের অভিশাপ।
মর্ত্যের ঊনপঞ্চাশ পবনে তা ক্ষণে ক্ষণে কেঁপে ওঠে,
জড়শক্তির অন্ধ দাপটে ভেঙে পড়তে চায়।

হায় রে বিংশ-শতাব্দীর মধ্যবিত্ত মহানাগরিক!
একলা পুরুষের উপার্জনে
জমাখরচের হিসেব আজ ত্রিশঙ্কু বেসামাল।
তাই অসূর্যম্পশ্য অন্তঃপুর থেকে সরীসৃপ পথে
নারীকে বেরিয়ে আসতে হয়
জীবিকার অন্বেষণে,
চলতে হয়
মেহনতি জনতার ভিড়ে।

আজকের মতো আমার দিনগত পাপক্ষয়
শেষ হয়েছে,
তোমার হয় নি।
তাই ফিরে এসে তাকিয়ে আছি পথের দিকে—
কখন অন্ধকার নড়ে উঠবে,
ধীরে ধীরে বেরিয়ে আসবে একটি ক্লান্ত করুণ মূর্তি,
আসবে তুমি।

একদিন তোমার মধ্যে চেয়েছি নারীকে,
আজ তোমাকেই চাই।
আমার জীবনযুদ্ধের অংশভাগিনী,
আমার আত্মার দোসর।

একটি আলোর পাখি

তুমিই নেভাও আলো,
তুমিই জ্বালাও।

রাত শেষ হয়ে গেলে
তবু রাত
রাতের আঁধারে জেগে থাকে।

বধির তিমিরে
প্রভাত-পাখির গান
ডুবে যায়।

দিশাহীন পথের দু'পাশে
জেগে থাকে
মরণের অতন্দ্র প্রহর।

নিরীশ্বর সেই অন্ধকারে
সব আলো নিভে গেলে
আবার তোমাতে ফিরে আসি।

একটি আলোর পাখি

একটি আলোর পাখি এসেছিল ফুলের বাগানে।
কণ্ঠে তার সুধা ছিল,
পাখায় ছিল রামধনু রং।
পাতার আড়াল থেকে
হাসি আর কান্না নিয়ে
ছিল তার চুনি-পান্না খেলা।
সে খেলায় আমাকে সে ডাক দিত
আলো আর গান আর ফুলের জগতে।

আমার ঘরের পাশে শ্যামস্নিগ্ধ সবজির ক্ষেত,
শস্যময় ফসলের মাঠ,
মৃত্তিকার পাত্র ভ'রে জীবনের সহস্র সঞ্চয়।
ওরি মাঝে
আলোর পাখির কণ্ঠ ছড়াতো আময়,
সব-কিছু হতো মধুময়।

সে-আলোর পাখি আজ ডেকে ডেকে চুপ করে গেছে
রামধনু রং থেকে ঝরে না গানের সুধা আর।
আমার ভুবন তাই শূন্য মনে হয়—
মূল্যহীন মনে হয় শ্যামস্নিগ্ধ সবজির ক্ষেত,
শস্যময় ফসলের মাঠ।

আমি শুধু খুঁজে ফিরি
একটি আলোর পাখি ফুলের বাগানে।
কণ্ঠে যার সুধা ঝরে,
পাখায় যে রামধনু রং।

জাগরণ

রাতের শেষপ্রহরে পুবের বারান্দায়
জপ করছিলুম ব্রাহ্মমুহূর্তের মন্ত্র—
তমসা থেকে আমাকে জ্যোতিতে নিয়ে চল,
মৃত্যু থেকে অমৃতে।

বিষণ্ণ বাসনার অন্ধকার মৃত্যুদূতের মতো
আমাকে ঘিরে ধরেছে।
আমার মনের সঙ্গে সুর মিলিয়ে
আকাশের রং বদল হচ্ছে।
কালো থেকে নীল,
নীল থেকে আশমানি,
আশমানি থেকে রজতশুভ্র।

রক্তগোলাপ

আজ সারাদিন আমার চেতনার মালঞ্চে
ফুটে আছে একটি রক্তগোলাপ,
তার সুরভির ঝরনাধারায়
স্নানাস্নান করে উঠলাম আমি।
জানি একদিন এ-ফুল শুকিয়ে পড়বে ঝরে,
বিবর্ণ হবে তার পাপড়িগুলি,
গন্ধ যাবে শূন্যে মিলিয়ে,
রক্তগোলাপ হয়ে যাবে একমুঠো ধুলো।

তবু আজ আমার মনের আকাশে
নতুন সূর্য উঠেছে রক্তগোলাপ হয়ে,
আমার মর্মকোষে তার সুরঝংকৃত অরুণআভা।
তারপর একদিন
সূর্যাস্তের রঙে রাঙা হবে বিদায়-দিগন্ত,
রক্তগোলাপের বিলীয়মান বেদনা
ছড়িয়ে পড়বে আকাশ জুড়ে।
আমার হৃদয়ের উৎসমুখে
আসন্ন হবে শেষমোক্ষণের পরম লগ্ন।
ঝরে পড়বে অনিঃশেষ ঝরনায় রক্তগোলাপ,
আমার অন্তিম বেদনা লীন হয়ে যাবে তারি সুরভিতে।

প্রাচীন কবির চোখে

একটি মিষ্টি পাখি
ভোরের শানাই হয়ে
রাতকে জাগায়।

আকাশের রঙ্গমঞ্চে শুরু হয়
ঊষা আর অরুণের বৈদিক নাটক।

পৃথিবীর প্রেক্ষাগারে ব'সে
প্রাচীন কবির চোখে
আমি দেখি প্রত্যহের ছবি।

নিশান্তের নীল মায়া
আরক্ত নয়ন মেলে
দিগন্তে বিলীন।

তবু

দেহের পিপাসা নিয়ে
আমি ভালোবাসিনি তোমাকে,
তবু দেহ আমাকে কাঁদায়।

আমি নই সহজিয়া বৈষ্ণব বাউল
আমার মানস-রাধা তুমি নও নও,

তবু তুমি আমাকে কাঁদাও।

হঠাৎ নিশুতি রাতে

গাঁয়ের জোছনা ছিল
মেঘে ঢাকা।

হঠাৎ নিশুতি রাতে
চোখ মেলে দেখি
নিঃশব্দ প্লাবনে ভাসে আকাশ-ভুবন।

গাছ খুমে পৃথিবী ঘুমায়।

জ্যোৎস্নার পিপাসা নিয়ে
একটি তরুণ সর্প
মন্ত্রমুগ্ধ ফণা উর্ধ্বে তুলে
শিহরিত পাথর।

নির্বাণ

আমি তো তোমারি চোখে শেষবার মৃত্যুকে দেখেছি।

তখন আকাশ
পৃথিবীর নগ্নবুকে তমোঘন আলিঙ্গনে বাঁধা।

আলোকের মুমূর্ষু নিশ্বাস
তারাগুলি
প্রত্যাসন্ন নির্বাণে নিমীল।

কালো রাত

কালো রাত
মৃত্যুর বাহন
চার পায়ে বিভীষিকা তুলে
ঢেকেছে আকাশ।

কালের ত্রিশূলে বিদ্ধ
প্রেম
যন্ত্রণায় নীল।

মাটির প্রদীপ ছিল ঘরে
নিভে গেল।

প্রেমের প্রতি প্রজ্ঞা

আমার জন্মদিনেই তোমার মৃত্যু হ'ল।
জানি
কালের চিতায় বার-বার দগ্ধ হওয়াই
তোমার নিয়তি।
তবু তুমি নাকি অব্যর্থবীর্য,
যত দগ্ধ হও ততই উজ্জ্বল!

হরকোপানলে ভস্মীভূত
তোমার অপমৃত্যু দেখলাম।
যৌবনের পতাকায় ত্রিভুবনজয়ী
তোমার পুনর্জন্ম দেখব কবে?

দুই মেরু

রাতের প্রহর গোনা
শেষ হলে
ভোরের আলোয় ফোটে
দক্ষিণের সুরভি-স্মারক।

যৌবন অমিতবীর্য স্বেচ্ছাবন্দী ফুলের নিগড়ে।

অস্তগোধূলিতে
বসন্তের ব্যর্থ প্রতিশ্রুতি
বেদনায় মেঘ হয়ে আকাশে ঘনায়!

বুকে দীর্ঘশ্বাস টেনে
উত্তর-হাওয়ার পথ পার হয়
নিঃসঙ্গ পথিক।

শেষরশ্মি

'হৃদয়ের শেষ ক'টি সক্রিয় প্রহরে
আরেক ফসল তুলে ঘরে
সুখী হব।'

পূর্বাশার পথে পথে
কালো কালো রক্তের অক্ষরে
ব্যক্তিত্বের জীর্ণ ইতিহাস।

ঘরের দেয়াল ভেঙে
গোধূলি ঘনিয়ে এল মাঠে।

পশ্চিমাস্ত পথিকের পরিক্লান্ত চোখের তারায়
দিনান্তের ইন্দ্রধনু অন্ধকার দিগন্তে হারায়।

ভোরের প্রথম কলি

ভোরের প্রথম কলি হাতে তুলে দিয়ে
বলেছিল :
গোধূলির লগ্ন এলে ফেলে দিয়ো
পথের ধুলোয়।

কেননা তখন
রজনীর প্রসাধনে বাসিফুল বেমানান হবে।

তবু এই ভোরের প্রসাদ
তোমাকে না দিলে
দিনের প্রহরগুলি হয়ে যাবে ম্লান।

আকাশে আগুন গায়ে

মজ্জায় কাঁপন-লাগা হিমে
আকাশে আগুন গায়ে
একা জাগে পৌষের রাত।

চাঁদ যদি সূর্য হ'ত···
মাঝে মাঝে মনে হয় তার।

মৃত্যুর পাওনা নিয়ে
মর্ত্ত থেকে ফিরে যাবে
নরকের দূত।

ততদিন যদি দিন থাকে
ফাল্গুন ফুটাবে ফুল
রোমাঞ্চিত রাতের তিমিরে।

মালা

মুক্তোর মালা
গলায় পরিয়ে দেব
সাধ ছিল,
সাধ্য ছিল না।

আজ চোখের জল
মালা হয়ে
গলায় দুলছে।

সে মালা বদল করে নেব
সাধ জাগে,
সাধ্য নেই।

প্লাবন

মনের আকাশ ঘিরে
নিরালোক অমা-নিশীথিনী।
শ্রাবণ-প্লাবনে ভাসে
হৃদয়ের অন্তিম কূলায়।

তবু দেখি
নিসর্গ-আকাশ
জ্যোৎস্নাস্নাত শুভ্র নীলিমায়
অপরূপ।

'প্লাবনে ভেসেছ বলে
আমাকেও অবিশ্বাসী আঁধারে ডোবাবে?'

এই ব'লে
মেঘের গুণ্ঠন খোলে
মধুরশ্মি জ্যোৎস্নার রাগিণী।

মাটির পিদিম ও মহাকাশ

আরো এক আলোর ভিতরে
আরো এক জীবনের প্রেমে
ওরা এই পৃথিবীর সীমা
ক্রমাগত পার হয়ে চলে।

নিরালোক মরণের আঁধি
আমাকে কেবলি ঘিরে থাকে
আমি তাই মাটির পিদিমে
জীবনের আলো খুঁজে ফিরি।

ওরা যায় চাঁদের আকাশে
চাঁদের মাটিকে ওরা ছোঁয়
তুমি যদি আমার আকাশ
আরেক আকাশে কেন যাই।

যং লব্ধ্বা…

একদিন ঈশ্বরকে ভালোবেসে বলেছিলুম
সবাইকে হারাতে পারি
তোমাকে পারব না।
তুমিই আমার সব—
আমার জীবনের জীবন।

তারপর একদিন পেলুম তোমাকে।
বুঝলুম
ঈশ্বরকে হারাতে পারি
তোমাকে পারব না।
তুমিই আমার সব
আমার ঈশ্বরের ঈশ্বর।

রাধা

প্রেমের বাঁশিতে
তোমার নামটি রাধা।
সেই নামে প্রেমময় ডাকেন তোমাকে ;
নামসমেতং কৃতসংকেতং বাদয়তে মৃদু বেণুং।

স্বষ্টিবৃন্দাবনে
শ্যামবর্ণা যমুনায় রহঃকেলি-কলিত হিল্লোল।
এই লীলানিকেতনে
হ্লাদিনী-প্রতিমা তুমি,
হরিণীবিহীন চাঁদ কনকলতায়।

তোমার প্রেমের লোভে
মানুষের রূপ ধরে আনন্দস্বরূপ।
তোমার চোখের আলো দুই চোখে মেখে
আত্মদীপ আপনাকে চেনে।
অপূর্ব আস্বাদময়ী আরতি তোমার,—
তারি প্রার্থনায়
শংকিত-সংকেত-কুঞ্জে
বিমুগ্ধ মাধব
রচয়তি শয়নং সচকিত নয়নং পশ্যতি তব পন্থানম্।

সমুদ্রের তীরে ব'সে ব'সে

সমুদ্রের তীরে ব'সে ব'সে
একটি অবুঝ মন
অকারণে হয়েছিল খুশি।
দেখেছিল
নীল জল সোনা হয় সকালে বিকেলে,
চাঁদের কিরণ ছুঁয়ে
ঢেউগুলি হাসে খিলখিল,
বাতাস মাতাল হলে
কি জানি কি যেন হয় তরলে অনিলে

সমুদ্রের তীরে ব'সে ব'সে
একটি অবুঝ মন
অকারণে হয়েছিল খুশি।

তারপর একদিন
একটি পাগল এসে
ডুবে গেল সমুদ্রের বুকে।
ডুবে গেল সে-অতলে
যেখানে ঢেউয়ের খেলা নেই,
সূর্য নেই, চন্দ্র নেই,
নেই কোনো মাতাল বাতাস।
ডুবে গেল,
এক হয়ে গেল।

সমুদ্রের তীরে ব'সে ব'সে
একটি অবুঝ মন
অকারণে হয়ে গেল কবি।

যামাদণ্ডে বিকশিত

যামাদণ্ডে বিকশিত
রজনীগন্ধার গুচ্ছ বুকে নিয়ে
কত রাত হ'ল কোজাগরী।

সূর্যোদয়ে
শুধু দিনযাপনের শুধু প্রাণধারণের
ক্ষতচিহ্ন-লাঞ্ছিত চেতনা।

তবু জানি
জীবজীবনের প্রান্তে আরো এক জন্ম আছে-
বহু জন্ম জন্মান্তর পার হয়ে হয়ে
সুরভিত সত্তার গভীরে
ফুল হয়ে ওঠা।